بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বই নং ৪৪। www.motaher21.net

يَسْخَرْ

" উপহাস "

" Scoff "

সুরা: আল-হুজুরাত

আয়াত নং :-11

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ لَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَ لَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۬ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَ مَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

হে ঈমানদারগণ, পুরুষরা যেন অন্য পুরুষদের বিদ্রূপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। আর মহিলারাও যেন অন্য মহিলাদের বিদ্রূপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অপরকে বিদ্রূপ করো না। এবং পরস্পরকে খারাপ নামে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর গোনাহর কাজে প্রসিদ্ধি লাভ করা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার। যারা এ আচরণ পরিত্যাগ করেনি তারাই জালেম।

শানে নুযূল :

শা'বী (রহঃ) বলেন, আমাকে আবূ জারির ইবনু যহহাক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : উক্ত আয়াতটি বানী সালামাহেদর ব্যাপারে নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় আগমন করলেন। আমাদের প্রত্যেকের প্রায় দু থেকে তিনটি নাম ছিল। নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কাউকে কোন এক নামে ডাকতেন তখন লোকেরা বলল : হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ নামে ডাকলে সে অসন্তুষ্ট হয়। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ ৪/২৬০, আরদাত দাবী হা. ৪৯৬২, ইবনু মাজাহ্ হা. ৩৭৪১, সহীহ)

কারো উপহাস করা, কাউকে নিয়ে ঠাট্টা করা, দোষারোপ করা, মন্দ নামে ডাকা ইত্যাদি সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করে। ফলে সমাজে অশান্তি নেমে আসে।

এ রোগ মহিলাদের মাঝে বেশি। তাই তাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১১ নম্বর আয়াতের তাফসীর :

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ কখনো একাকী বাস করতে পারে না। সমাজে বাস করতে হলে সমাজের ভারসাম্য ও স্থীতিশীলতা বজায় রাখা আবশ্যক। সে জন্য আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত বিধানগুলো দিলেন। আয়াতের শুরুতেই আবারও মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যেমন সূরার শুরুতে করা হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতে হবে।

কোন ব্যক্তিকে নিয়ে উপহাস করা, ঠাট্টা করা, মন্দ নামে ডাকা, সম্মানের হানি করা এবং তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করার সকল পন্থা ইসলামে হারাম। অনেকে মানুষের আকার-অবয়ব, অস্বচ্ছলতা ইত্যাদি নিয়ে তুচ্ছ মনে করে উপহাস ও ঠাট্টা করে থাকে। তা কোন সময় কথা, কোন সময় ইশারা-ইঙ্গিত আবার কোন সময় অভিনয় করার মাধ্যমেও হতে পারে। এরূপ করা হারাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হাজ্জে বলে গেছেন :

তোমাদের সম্পদ সম্মান আজকের দিনের মতো হারাম। একজন ব্যক্তি অন্যকে নিয়ে তখনই ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করতে পারে যখন তাকে হীন ও ছোট মনে করে এবং নিজেকে বড় মনে করে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আকৃতি ও সম্পদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমল। (সহীহ মুসলিম হা. ৬৭০৮) অথচ ঈমান ও আমলের দিক দিয়ে কে উত্তম তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

আল্লাহ তা'আলা ঠাট্টাকারীদেরকে তিরস্কার ও ধমকে দিয়ে বলেন :

(اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ط سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ز وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ)

“মু’মিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে; তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।” (আত্ তাওবাহ ৯ : ৭৯)

(وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ)

অর্থাৎ মানুষকে দোষারোপ করো না। অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

(وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ)

“প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ।” (সূরা আল হুমাযাহ্ ১০৪ : ১)

অন্যত্র মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

(هَمَّازٍ مَّشَّاءٍۭ بِنَمِيمٍ)

“দোষারোপকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়।” (আল ক্বালাম ৬৮ : ১১)

(وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ....)

[১] এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে উপহাস বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ তখনই করে, যখন সে নিজেকে তার চাইতে উত্তম এবং তাকে নিজের চেয়ে হীন ও ছোট মনে করে। অথচ আল্লাহর কাছে ঈমান ও আমলের দিক দিয়ে কে উত্তম, আর কে নয় --এ জ্ঞান কেবল তাঁরই কাছে। কাজেই নিজেকে উৎকৃষ্ট এবং অপরকে নিকৃষ্ট মনে করার কোনই বৈধতা নেই। তাই আয়াতে অপরকে উপহাস করা হতে নিষেধ করা হয়েছে। আর চারিত্রিক এ রোগ মহিলাদের মধ্যে অধিকহারে বিদ্যমান থাকায় তাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করে বিশেষভাবে তাদেরকে এ কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। রসূল (সাঃ)-এর হাদীসে মানুষকে তুচ্ছ মনে করাকে 'অহংকার' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, (الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ) (মুসলিম ৯১নং, তিরমিযী, হাকেম ১/২৬) আর অহংকার ও অহংকারীকে আল্লাহ চরম ঘৃণা করেন।

[২] অর্থাৎ, কোন দোষ বা ত্রুটি ধরে একে অপরকে খোঁটা দিও না। যেমন বলা, তুই তো অমুকের বেটা না, তোর মা তো এ রকম ও রকম, তুই তো অমুক বংশের না! ইত্যাদি।

[৩] অর্থাৎ, ব্যঙ্গ ও তুচ্ছজ্ঞান করে মানুষের এমন নাম রেখো না (বা এমন খেতাব বের করো না), যা সে পছন্দ করে না। অথবা তার ভাল ও সুন্দর নামকে বিকৃত করে ডেকো না।

[৪] অর্থাৎ, এইভাবে নাম বিকৃত করে অথবা মন্দ নাম বা খেতাব রেখে সেই নামে ডাকা, কিংবা ইসলাম গ্রহণ বা তওবা করার পর তাকে অতীত ধর্ম বা পাপের সাথে সম্পৃক্ত করে সম্বোধন করা; যেমন, এ কাফের! এ ইয়াহুদী! এ লম্পট! এ মাতাল! ইত্যাদি বলে সম্বোধন করা অতীব মন্দ ও গর্হিত কাজ। الاسْم এখানে الذِّكْرُ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ, بِئْسَ الاسْمُ الَّذِيْ يُذْكَرُ بِالفِسْقِ بَعْد دُخُوْلِهِمْ فِي الإِيْمَانِ (فتح القدير) অবশ্য কোন কোন গুণগত নাম কারো কারো নিকট এ নিষেধের আওতাভুক্ত নয়, যা লোক মাঝে প্রসিদ্ধ হয়ে যায় এবং সে এ নামে স্বীয় অন্তরে কোন দুঃখ বা রাগও অনুভব করে না। যেমন, খোঁড়া নামে প্রসিদ্ধ কোন খোঁড়াকে 'খোঁড়া' বলে ডাকা, কালিয়া অথবা কালু নামে প্রসিদ্ধ কোন কালো রঙের লোককে 'কালিয়া', 'কালো' বা 'কালু' বলে ডাকা ইত্যাদি। (কুরতুববী)

পূর্বের দু'টি আয়াতে মুসলমানদের পারস্পরিক লড়াই জরুরী নির্দেশনা দেয়ার পর ঈমানদারদেরকে এ অনুভূতি দেয়া হয়েছিল যে, ইসলামের পবিত্রতম সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা একে অপরের ভাই এবং আল্লাহর ভয়েই তাদেরকে নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক রাখার চেষ্টা করা উচিত। এখন পরবর্তী দু'টি আয়াতে এমন সব বড় বড় অন্যায়ের পথ রুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যা সাধারণত লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। একে অপরের ইজ্জতের ওপর হামলা, একে অপরকে মনোকষ্ট দেয়া, একে অপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা এবং একে অপরের দোষ-ত্রুটি তালাশ করা পারস্পারিক শত্রুতা সৃষ্টির এগুলোই মূল কারণ। এসব কারণ অন্যান্য কারণের সাথে মিশে বড় বড় ফিতনার সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে পরবর্তী আয়াতসমূহে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তার যেসব ব্যাখ্যা হাদিসসমূহে পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে মানহানি (Law of Libel) সম্পর্কিত বিস্তারিত আইন-বিধান রচনা করা যেতে পারে। পাশ্চাত্যের মানহানি সম্পর্কিত আইন এক্ষেত্রে এতটাই অসম্পূর্ণ যে, এ আইনের অধীনে কেউ মানহানীর অভিযোগ পেশ করে নিজের মার্যাদা আরো কিছু খুইয়ে আসে। পক্ষান্তরে ইসলামী আইন প্রত্যেক ব্যক্তির এমন একটি মৌলিক মর্যাদার স্বীকৃতি দেয় যার ওপর কোন আক্রমণ চালানোর অধিকার কারো নেই। এক্ষেত্রে হামলা বাস্তবতা ভিত্তিক হোক বা না হোক এবং যার ওপর আক্রমণ করা হয়, জনসম্মুখে তার কোন সুপরিচিত মর্যাদা থাক বা না থাক তাতে কিছু যায় আসে না। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে অপমান করেছে শুধু এতটুকু বিষয়ই তাকে অপরাধী প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। তবে এ অপমান করার যদি কোন শরীয়াতসম্মত বৈধতা থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

বিদ্রূপ করার অর্থ কেবল কথার দ্বারা হাসি-তামাসা করাই নয়। বরং কারো কোন কাজের অভিনয় করা, তার প্রতি ইঙ্গিত করা, তার কথা, কাজ, চেহারা বা পোশাক নিয়ে হাসাহাসি করা অথবা তার কোন ত্রুটি বা দোষের দিকে এমনভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাতে অন্যদের হাসি পায়। এ সবই হাসি-তামাসার অন্তরভুক্ত। মূল নিষিদ্ধ বিষয় হলো কেউ যেন কোনভাবেই কাউকে উপহাস ও হাসি-তামাসার লক্ষ্য না বানায়। কারণ, এ ধরনে হাসি-তামাসা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের পেছনে নিশ্চিতভাবে নিজের বড়ত্ব প্রদর্শন এবং অপরের অপমানিত করা ও হেয় করে দেখানোর মনোবৃত্তি কার্যকর। যা নৈতিকভাবে অত্যন্ত দোষণীয়। তাছাড়া এভাবে অন্যের মনোকষ্ট হয় যার কারণে সমাজে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ কারণেই এ কাজকে হারাম করে দেয়া হয়েছে। পুরুষ ও নারীদের কথা আলাদা করে উল্লেখ করার অর্থ এ নয় যে, পুরুষদের নারীদেরকে বিদ্রূপের লক্ষ্য বানানো এবং নারীদের পুরুষদের হাসি-তামাসার লক্ষ্য বানানো জায়েয। মূলত যে কারণে নারী ও পুরুষের বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে, ইসলাম এমন সমাজ আদৌ সমর্থন করে না। যেখানে নারী অবাধে মেলামেশা করতে পারে। অবাধ খোলামেলা মজলিসেই সাধারণত একজন আরেকজনকে হাসি-তামাসার লক্ষ্য বানাতে পারে। মুহাররাম নয় এমন নারী পুরুষ কোন মজলিসে একত্র হয়ে পরস্পর হাসি-তামাসা করবে ইসলামে এমন অবকাশ আদৌ রাখা হয়নি। তাই একটি মুসলিম সমাজের একটি মজলিসে পুরুষ কোন নারীকে উপহাস ও বিদ্রূপ করবে কিংবা নারী কোন পুরুষকে বিদ্রূপ ও উপহাস করবে এমন বিষয় কল্পনার যোগ্যও মনে করা হয়নি।

মূল আয়াতে لمز শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটির মধ্যে বিদ্রূপ ও কুৎসা ছাড়াও আরো কিছু সংখ্যক অর্থ এর মধ্যে শামিল। যেমনঃ উপহাস করা, অপবাদ আরোপ করা, দোষ বের করা এবং খোলাখুলি বা গোপনে অথবা ইশারা-ইঙ্গিত করে কাউকে তিরস্কারের লক্ষ্যস্থল বানানো। এসব কাজও যেহেতু পারস্পরিক সুস্পর্ক নষ্ট করে এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাই এসব কাজও হারাম করে দেয়া হয়েছে। এখানে আল্লাহর ভাষার চমৎকারিত্ব এই যে, لَايَلْمِزُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا একে অপরকে বিদ্রূপ করো না।) বলার পরিবর্তে وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ নিজেকে নিজে বিদ্রূপ করো না) কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা স্বতই একথার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অন্যদের বিদ্রূপ ও উপহাসকারী প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই বিদ্রূপ ও উপহাস করে। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, যতক্ষণ না করো মনে কুপ্রেরণার লাভা জমে উপচে পড়ার জন্য প্রস্তুত না হবে ততক্ষণ তার মুখ অন্যদের কুৎসা রটনার জন্য খুলবে না। এভাবে এ মানসিকতার লালনকারী অন্যদের আগে নিজেকেই তো কুকর্মের আস্তানা বানিয়ে ফেলে। তারপর যখন সে অন্যদের ওপর আঘাত করে তখন তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সে তার নিজের ওপর আঘাত করার জন্য অন্যদেরকে আহবান করছে। ভদ্রতার কারণে কেউ যদি তার আক্রমণ এড়িয়ে চলে তাহলে তা ভিন্ন কথা। কিন্তু যাকে সে তার বাক্যবাণের লক্ষ্যস্থল বানিয়েছে সে-ও পাল্টা তার ওপর আক্রমণ করুক এ দরজা সে নিজেই খুলে দিয়েছে।

এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোন ব্যক্তিকে এমন নামে ডাকা না হয় অথবা এমন উপাধি না দেয়া হয় যা তার অপছন্দ এবং যা দ্বারা তার অবমাননা ও অমর্যাদা হয়। যেমন কাউকে ফাসেক বা মুনাফিক বলা। কাউকে খোঁড়া, অন্ধ অথবা কানা বলা। কাউকে তার নিজের কিংবা মা-বাপের অথবা বংশের কোন দোষ বা ত্রুটির সাথে সম্পর্কিত করে উপাধি দেয়া। মুসলমান হওয়ার পর তার পূর্ব অনুসৃত ধর্মের কারণে ইহুদী বা খৃস্টান

বলা। কোন ব্যক্তি, বংশ, আত্মীয়তা অথবা গোষ্ঠির এমন নাম দেয়া যার মধ্যে তার নিন্দা ও অপমানের দিকটি বিদ্যমান। তবে যেসব উপাধি বাহ্যত খারাপ কিন্তু তা দ্বারা কারো নিন্দা করা উদ্দেশ্য নয়, বরং ঐ উপাধি দ্বারা যাদের সম্বোধন করা হয় তা তাদের পরিচয়ের সহায়ক এমন সব উপাধি এ নির্দেশের মধ্যে পড়ে না। এ কারণে মুহাদ্দিসগণ "আসমাউর রিজাল" (বা হাদীসের রাবীদের পরিচয় মূলক) শাস্ত্রে সুলায়মান আল আ'মাশ (ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন সুলায়মান) এবং ওয়াসেল আল আহদাব (কুঁজো ওয়াসেল) এর মত নামের উল্লেখ রেখেছেন। যদি একই নামের কয়েকজন লোক থাকে এবং তাদের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তার বিশেষ কোন উপাধি দ্বারাই কেবল চেনা যায় তাহলে ঐ উপাধি খারাপ হলেও তা বলা যেতে পারে। যেমন আবদুল্লাহ নামের যদি কয়েকজন লোক থাকে আর তাদের মধ্যে একজন অন্ধ হয় তাহলে তাকে চেনা সুবিধার জন্য আপনি অন্ধ আবদুল্লাহ বলতে পারেন। অনুরূপ এমন সব উপাধি বা উপনাম এ নির্দেশের মধ্যে পড়বে না যা দ্বারা বাহ্যত অমর্যাদা বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ভালবাসা ও স্নেহবশতই রাখা হয় এবং যাদেরকে এ উপাধি বা উপনামে ডাকা হয় তারা নিজেরাও তা পছন্দ করে। যেমন, আবু হুরাইরা এবং আবু তুরাব।

ঈমানদার হওয়া সত্বেও সে কটুভাষী হবে এবং অসৎ ও অন্যায় কাজের জন্য বিখ্যাত হবে এটা একজন ঈমানদারের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার। কোন কাফের যদি মানুষকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করা কিংবা বেছে বেছে বিদ্রূপাত্মক নাম দেয়ার ব্যাপারে খুব খ্যাতি লাভ করে তাহলে তা মনুষ্যত্বের বিচারে যদিও সুখ্যাতি নয় তবুও অন্তত তার কুফরীর বিচারে তা মানায়। কিন্তু কেউ আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং আখেরাত বিশ্বাস করা সত্বেও যদি এরূপ হীন বিশেষণে ভূষিত হয় তাহলে তার জন্য পানিতে ডুবে মরার শামিল।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয় :

১. মানুষকে নিয়ে ঠাট্টা করা হারাম।

২. কাউকে অন্যায়ভাবে দোষারোপ করা ও মন্দ নামে ডাকাও হারাম।

৩. এ সব কাজ সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করে।

৪. আয়াতে মহিলাদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ এ সকল কাজে তারাই অগ্রগামী।

সুরা: আল-হুজুরাত

আয়াত নং :-12

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

হে ঈমানদারগণ, বেশী ধারণা ও অনুমান করা থেকে বিরত থাকো কারণ কোন কোন ধারণা ও অনুমান গোনাহ। দোষ অন্বেষণ করো না। আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। এমন কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছে, যে তার নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? দেখো, তা খেতে তোমাদের ঘৃণা হয়। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ অধিক পরিমাণে তাওবা কবুলকারী এবং দয়ালু।

তাফসীর :

এই আয়াতে পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতি-নীতি ব্যক্ত হয়েছে এবং এতে তিনটি বিষয় হারাম করা হয়েছে। (এক) ধারণা, (দুই) কোনো গোপন দোষ সন্ধান করা এবং (তিন) গীবত অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে এমন কথা বলা যা সে শুনলে অসহনীয় মনে করত।

তন্মধ্যে প্রথম বিষয় হচ্ছে, الظن বা প্রবল ধারণা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের কারও আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা পোষণ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করা উচিত নয়।" [মুসলিম: ৫১২৫, আবুদাউদ: ২৭০৬, ইবনে মাজাহ: ৪১৫৭]

অন্য এক হাদীসে আছে 'আমি আমার বান্দার সাথে তেমনি ব্যবহার করি, যেমন সে আমার সম্বন্ধে ধারণা রাখে। এখন সে আমার প্রতি যা ইচ্ছা ধারণা রাখুক। [মুসনাদে আহমাদ: ১৫৪৪২] এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা ফরয এবং কু-ধারণা পোষন করা হারাম। এমনিভাবে যেসব মুসলিম বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে সৎকর্মপরায়ণ দৃষ্টিগোচর হয়, তাদের সম্পর্কে প্রমাণ ব্যতিরেকে কু-ধারণা পোষণ করা হারাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, ধারণা মিথ্যা কথার নামান্তর।' [বুখারী: ৪০৬৬, মুসলিম: ২৫৬৩]

আয়াতে দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে, কারও দোষ সন্ধান করা। এর দ্বারা নানা রকম ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এ কারণে একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার খোতবার দোষ অন্বেষণকারীদের সম্পর্কে বলেছেনঃ "হে সেই সব লোকজন, যারা মুখে ঈমান এনেছো। কিন্তু এখনো ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলিমদের গোপনীয় বিষয় খোঁজে বেড়িও না। যে ব্যক্তি মুসলিমদের দোষ-ত্রুটি তালাশ করে বেড়াবে আল্লাহ্ তার দোষ-ত্রুটির অন্বেষণে লেগে যাবেন। আর আল্লাহ যার ত্রুটি তালাশ করেন তাকে তার ঘরের মধ্যে লাঞ্ছিত করে ছাড়েন।" [আবু দাউদ: ৪৮৮০]

মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ আমি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ "তুমি যদি মানুষের গোপনীয় বিষয় জানার জন্য পেছনে লাগো। তাদের জন্য বিপর্যয় সৃষ্টি করবে কিংবা অন্তত বিপর্যয়ের দ্বার প্রান্তে পৌছে দেবে।" [আবু দাউদ: ৪৮৮৮] অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মুসলিমদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ অনুসন্ধান করো না। কেননা, যে ব্যক্তি মুসলিমদের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে স্ব-গৃহেও লাঞ্ছিত করে দেন।" [আবুদাউদ: ৪৮৮০]

দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান না করার এ নির্দেশ শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়, বরং ইসলামী সরকারের জন্যেও। এ ক্ষেত্রে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ ঘটনা অতীব শিক্ষাপ্রদ। একবার রাতের বেলা তিনি এক ব্যক্তির কন্ঠ শুনতে পেলেন। সে গান গাইতেছিল। তাঁর সন্দেহ হলো। তিনি তার সাথী আব্দুর রহমান ইবন আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেনঃ এ ঘরটি কার? বলা হল, এটা রবী'আ ইবন উমাইয়া ইবন খালফ এর ঘর। তারা এখন শরাব খাচ্ছে। আপনার কি অভিমত? অতঃপর আব্দুর রাহমান ইবন আওফ বললেন, আমার অভিমত হচ্ছে যে, আমরা আল্লাহ যা নিষেধ করেছে তা-ই করে ফেলছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করে বলেছেন: "তোমরা গোপন বিষয়ে অন্বেষণ করো না"। [সূরা আল-হুজুরাত: ১২]

তখন উমর ফিরে আসলেন এবং তাকে ছেড়ে গেলেন।[মুস্তাদরাকে হাকিম: ৮২৪৯, মাকারিমূল আখলাক:আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে জাফর আল খারায়েতী: ৩৯৮,৪২০, মুসান্নাফে আদির রাজ্জাকঃ ১০/২২১] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, খুঁজে খুঁজে মানুষের গোপন দোষ-ত্রুটি বের করা এবং তারপর তাদেরকে পাকড়াও করা শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়, ইসলামী সরকারের জন্যও জায়েয নয়। একটি হাদীসেও একথা উল্লেখিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "শাসকরা যখন সন্দেহের বশে মানুষের দোষ অনুসন্ধান করতে শুরু করে তখন তাদের চরিত্র নষ্ট করে দেয়।" [আবু দাউদ: ৪৮৮৯]

আয়াতে নিষিদ্ধ তৃতীয় বিষয় হচ্ছে গীবত। গীবতের সংজ্ঞায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কারো এমন কথা বলা যা শুনলে সে অপছন্দ করবে। প্রশ্ন হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সত্যিই থেকে থাকে তাহলে আপনার মত কি? তিনি বললেনঃ তুমি যা বলছো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তো তুমি তার গীবত করলে। আর তা যদি না থাকে তাহলে অপবাদ আরোপ করলে।" [মুসলিম: ২৫৮৯, আবুদাউদ: ৪৮৭৪, তিরমিযীঃ ১৯৩৪]

এই আয়াতে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করতে গিয়ে গীবিতের নিষিদ্ধতাকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং একে মৃত মুসলিমের মাংস ভক্ষণের সমতুল্য প্রকাশ করে এর নিষিদ্ধতা ও নীচতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মি'রাজের রাত্রির হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তারপর আমাকে নিয়ে যাওয়া হল, আমি এমন এক সম্পপ্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলাম যাদের নখ ছিল তামার। তারা তাদের মুখমণ্ডল ও দেহের মাংস আচড়াচ্ছিল। আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বললেনঃ এরা তাদের ভাইয়ের গীবত করত এবং তাদের ইজ্জতহানি করত। [মুসনাদে আহমাদ: ৩/২২৪, আবুদাউদ: ৪৮৭৮]

একেবারেই ধারণা করতে নিষেধ করা হয়নি। বরং খুব বেশী ধারণার ভিত্তিতে কাজ করতে এবং সব রকম ধারণার অনুসরণ থেকে মানা করা হয়েছে। এর কারণ বলা হয়েছে এই যে, অনেক ধারণা গোনাহের পর্যায়ে পড়ে। এ নির্দেশটি বুঝার জন্য আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত ধারণা কত প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের নৈতিক অবস্থা কি?এক প্রকারের ধারণা হচ্ছে, যা নৈতিকতার দৃষ্টিতে অত্যন্ত পছন্দনীয় এবং দ্বীনের দৃষ্টিতেও কাম্য ও প্রশংসিত। যেমনঃ আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং ঈমানদারদের ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ করা। তাছাড়া যাদের সাথে ব্যক্তির মেলামেশা ও উঠাবসা আছে এবং যাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।আরেক প্রকার ধারণা আছে যা বাদ দিয়ে বাস্তব জীবনে চলার কোন উপায় নেই। যেমন আদালতে বিচারকের সামনে যেসব সাক্ষ্য পেশ করা হয় তা যাঁচাই বাছাই করে নিশ্চিত প্রায় ধারণার ভিত্তিতে ফায়সালা করা ছাড়া আদালত চলতে পারে না। কারণ, বিচারকের পক্ষে ঘটনা সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। আর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা নিশ্চিত সত্য হয় না, বরং প্রায় নিশ্চিত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। যেক্ষেত্রে কোন না কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়ে, কিন্তু বাস্তব জ্ঞান লাভ বাস্তব হয় না সেক্ষেত্রে ধারণার ওপর ভিত্তি করে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া মানুষের জন্য আর কোন উপায় থাকে না।তৃতীয় এক প্রকারের ধারণা আছে যা মূলত খারাপ হলেও বৈধ প্রকৃতির। এ প্রকারের ধারণা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। যেমনঃ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির চরিত্র ও কাজ-কর্মে কিংবা তার দৈনন্দিন আচার-আচরণ ও চালচলনে এমন সুস্পষ্ট লক্ষণ ফুটে উঠে যার ভিত্তিতে সে আর ভাল ধারণার যোগ্য থাকে না। বরং তার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণের একাধিক যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান। এরূপ পরিস্থিতিতে শরীয়াত কখনো এ দাবী করে যে, সরলতা দেখিয়ে মানুষ তার প্রতি অবশ্যই ভাল ধারণা পোষণ করবে। তবে বৈধ খারাপ ধারণা পোষণের চূড়ান্ত সীমা হচ্ছে তার সম্ভাব্য দুস্কৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নিছক ধারণার ভিত্তিতে আরো অগ্রসর হয়ে তার বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা চালানো ঠিক নয়।চতুর্থ আরেক প্রকারের ধারণা আছে যা মূলত গোনাহ, সেটি হচ্ছে, বিনা কারণে কারো অপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা কিংবা অন্যদের ব্যাপারে মতস্থির করার বেলায় সবসময় খারাপ ধারণার ওপর ভিত্তি করেই শুরু করা কিংবা এমন লোকদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করা যাদের বাহ্যিক অবস্থা তাদের সৎ ও শিষ্ট হওয়ার প্রমাণ দেয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি কোন কথা বা কাজে যদি ভাল ও মন্দের সমান সম্ভাবনা থাকে কিন্তু খারাপ ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা যদি তা খারাপ হিসেবেই ধরে নেই তাহলে তা গোনাহের কাজ বলে গণ্য হবে। যেমনঃ কোন সৎ ও ভদ্র লোক কোন মাহফিল থেকে উঠে যাওয়ার সময় নিজের জুতার পরিবর্তে অন্য কারো জুতা উঠিয়ে নেন আমরা যদি ধরে নেই যে, জুতা চুরি করার উদ্দেশ্যেই তিনি এ কাজ করেছেন। অথচ এ কাজটি ভুল করেও হতে পারে। কিন্তু ভাল সম্ভাবনার দিকটি বাদ দিয়ে খারাপ সম্ভাবনার দিকটি গ্রহণ করার কারণ খারাপ ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।এ বিশ্লেষণ থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ধারণা করা কোন নিষিদ্ধ বিষয় নয়। বরং কোন কোন পরিস্থিতিতে তা পছন্দনীয়, কোন কোন পরিস্থিতিতে অপরিহার্য, কোন কোন পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জায়েয কিন্তু ঐ সীমার বাইরে নাজায়েয এবং কোন কোন পরিস্থিতিতে একেবারেই নাজায়েয। তাই একথা বলা হয়নি যে, ধারণা বা খারাপ ধারণা করা থেকে একদম বিরত থাকো। বরং বলা হয়েছে, অধিক মাত্রায় ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। তাছাড়া নির্দেশটির উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করার জন্য আরো বলা হয়েছে, কোন কোন ধারণা গোনাহ। এ সতর্কীকরণ দ্বারা আপনা থেকেই বুঝা যায় যে, যখনই কোন ব্যক্তি

ধারণার ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে কিংবা কোন পদক্ষেপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তখন তার ভালভাবে যাচাই বাছাই করে দেখা দরকার, যে ধারণা সে পোষণ করছে তা গোনাহর অন্তর্ভুক্ত নয় তো? আসলেই কি এরূপ ধারণা পোষনের দরকার আছে? এরূপ ধারণা পোষনের জন্য তার কাছে যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি? সে ধারণার ভিত্তিতে সে যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছে তা কি বৈধ? যেসব ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এতটুকু সাবধানতা তারা অবশ্যই অবলম্বন করবে। লাগামহীন ধারণা পোষণ কেবল তাদেরই কাজ যারা আল্লাহর ভয় থেকে মুক্ত এবং আখেরাতের জবাবদিহি সম্পর্কে উদাসীন।

অর্থাৎ মানুষের গোপন বিষয় তালাশ করো না। একজন আরেকজনের দোষ খুঁজে বেড়িও না। অন্যদের অবস্থা ও ব্যাপার স্যাপার অনুসন্ধান করে বেড়াবে না। খারাপ ধারণা বশবর্তী হয়ে এ আচরণ করা হোক কিংবা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য করা হোক অথবা শুধু নিজের কৌতুহল ও ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য করা হোক শরীয়াতের দৃষ্টিতে সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। অন্যদের যেসব বিষয় লোকচক্ষুর অন্তরালে আছে তা খোঁজাখুঁজি করা এবং কার কি দোষ-ত্রুটি আছে ও কার কি কি দুর্বলতা গোপন আছে পর্দার অন্তরালে উঁকি দিয়ে তা জানার চেষ্টা করা কোন মু'মিনের কাজ নয়। মানুষের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পড়া, দু'জনের কথোপকথন কান পেতে শোনা, প্রতিবেশীর ঘরে উঁকি দেয়া এবং বিভিন্ন পন্থায় অন্যদের পারিবারিক জীবন কিংবা তাদের ব্যক্তিগত বিষয়াদি খোঁজ করে বেড়ানো একটি বড় অনৈতিক কাজ। এর দ্বারা নানা রকম ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এ কারণে একবার নবী (সা.) তার খোতবায় দোষ অন্বেষণকারীদের সম্পর্কে বলেছেনঃ

يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِى بَيْتِهِ (ابو داؤد)

"হে সেই সব লোকজন, যারা মুখে ঈমান এনেছো কিন্তু এখনো ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলমানদের গোপনীয় বিষয় খুঁজে বেড়িও না। যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি তালাশ করে বেড়াবে আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটির অন্বেষণে লেগে যাবেন। আর আল্লাহর যার ত্রুটি তালাশ করেন তাকে তার ঘরের মধ্যে লাঞ্ছিত করে ছাড়েন।" (আবু দাউদ)

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বলেন, আমি নিজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ

إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ "তুমি যদি মানুষের গোপনীয় বিষয় জানার জন্য পেছনে লাগো। তাদের জন্য বিপর্যয় সৃষ্টি করবে কিংবা অন্তত বিপর্যয়ের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেবে।" (আবু দাউদ)

অপর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

اذا ظننتم الا تحققوا (احكام القران – للجصاص)

“তোমাদের মনে করো সম্পর্কে সন্দেহ হলে, অন্বেষণ করো না।” (আহকামুল কুরআন--জাস্সাস)

অপর একটি হাদীসে নবী (সা.) বলেছেনঃ

من رأئى عورة فسترها كان كمن احيا موؤدة (الجصاص)

“কেউ যদি কারো গোপন দোষ-ত্রুটি দেখে ফেলে এবং তা গোপন রাখে তাহলে সে যেন একজন জীবন্ত পুঁতে ফেলা মেয়ে সন্তানকে জীবন দান করলো।” (আল জাস্সাস) দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান না করার এ নির্দেশ শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়, বরং ইসলামী সরকারের জন্যও। ইসলামী শরীয়াত নাহী আনিল মুনকারের (মন্দ কাজের প্রতিরোধ) যে দায়িত্ব সরকারের ওপর ন্যস্ত করেছে তার দাবী এ নয় যে, সে একটি গোয়েন্দা চক্র কায়েম করে মানুষের গোপন দোষ-ত্রুটিসমূহ খুঁজে খুঁজে বের করবে এবং তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবে। বরং যেসব অসৎ প্রবণতা ও দোষ-ত্রুটি প্রকাশ হয়ে পড়বে কেবল তার বিরুদ্ধেই তার শক্তি প্রয়োগ করা উচিত। গোপনীয় দোষ-ত্রুটি ও খারাপ চালচলন সংশোধনের উপায় গোয়েন্দাগিরি নয়। বরং শিক্ষা ওয়াজ-নসীহত, জনসাধারণের সামগ্রিক প্রশিক্ষণ এবং একটি পবিত্র সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করাই তার একমাত্র উপায়। এক্ষেত্রে হযরত উমরের (রা.) এ ঘটনা অতীব শিক্ষাপ্রদ। একবার রাতের বেলা তিনি এক ব্যক্তির কণ্ঠ শুনতে পেলেন। সে গান গাইতেছিল। তাঁর সন্দেহ হলো। তিনি প্রাচীরে উঠে দেখলেন সেখানে শরাব প্রস্তুত, তার সাথে এক নারীও। তিনি চিৎকার করে বললেনঃ ওরে আল্লাহর দুশমন, তুই কি মনে করেছিস যে, তুই আল্লাহর নাফরমানী করবি আর তিনি তোর গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করবেন না? জবাবে সে বললোঃ আমীরুল মু'মেনীন, তাড়াহুড়ো করবেন না। আমি যদি একটি গোনাহ করে থাকি তবে আপনি তিনটি গোনাহ করেছেন। আল্লাহ দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আপনি দোষ-ত্রুটি খুঁজেছেন। আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন, দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করো। কিন্তু আপনি প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছেন। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, নিজের ঘর ছাড়া অনুমতি না নিয়ে অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না। কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়াই আপনি আমার ঘরে পদার্পণ করেছেন।” এ জবাব শুনে হযরত উমর (রা.) নিজের ভুল স্বীকার করলেন এবং তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করলেন না। তবে তিনি তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, সে কল্যাণ ও সুকৃতির পথ অনুসরণ করবে। (মাকারিমুল আখলাক-আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর আলী খারায়েতী) এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, খুঁজে খুঁজে মানুষের গোপনীয় দোষ-ত্রুটি বের করা এবং তারপর তাদেরকে পাকড়াও করা শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়, ইসলামী সরকারের জন্যও জায়েয নয়। একটি হাদীসেও একথা উল্লেখিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে নবী (সা.) বলেছেনঃ

إِنَّ الأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِى النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ(ابو داؤد)

“শাসকরা যখন সন্দেহের বশে মানুষের দোষ অনুসন্ধান করতে শুরু করে তখন তাদের চরিত্র নষ্ট করে দেয়।” (আবু দাউদ) তবে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি খোঁজ-খবর নেয়া ও অনুসন্ধান করা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তবে সেটা এ নির্দেশের আওতাভুক্ত নয়। যেমনঃ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচার-আচরণে বিদ্রোহের কিছুটা লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে তারা কোন অপরাধ সংঘটিত করতে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা সৃষ্টি হলে সরকার তাদের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে পারে। অথবা কোন ব্যক্তিকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয় বা তার সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন করতে চায় তাহলে তার ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্য সে তার সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে ও খোঁজ-খবর নিতে পারে।

গীবতের সংজ্ঞা হচ্ছে, “কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কারো এমন কথা বলা যা শুনলে সে অপছন্দ করবে।” খোদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে গীবতের এ সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। মুসলমি, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী এবং আরো অনেক হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরাইরা থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ঐ হাদীসে নবী (সা.) গীবতের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছেঃ

ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ - قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِى أَخِى مَا أَقُولُ؟ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ-

“গীবত হচ্ছে, তুমি এমনভাবে তোমার ভাইয়ের কথা বললে যা তার কাছে অপছন্দনীয়। প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সত্যিই থেকে থাকে তাহলে আপনার মত কি? তিনি বললেনঃ তুমি যা বলছো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তো তুমি তার গীবত করলে। আর তা যদি না থাকে তাহলে অপবাদ আরোপ করলে।”ইমাম মালেক (র) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে হযরত মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ থেকে এ বিষয়ে আর একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যার ভাষা নিম্নরূপঃ

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا الْغِيبَةُ؟ فَقَالَ أَنْ تَذْكُرَ مِنَ الْمَرْءِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ - فقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ حَقًّا؟ قَالَ إِذَا قُلْتَ بَاطِلاً فَذَلِكَ الْبُهْتَانُ-

“এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, গীবত কাকে বলে? তিনি বললেনঃ কারো সম্পর্কে তোমার এমন কথা বলা যা তার পছন্দ নয়। সে বললোঃ হে আল্লাহর রসূল, যদি আমার কথা সত্য হয়? তিনি জবাব দিলেনঃ তোমার কথা মিথ্যা হলে তো সেটা অপবাদ।”রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এসব বাণী থেকে প্রমাণিত হয় যে, কারো বিরুদ্ধে তার অনুপস্থিতিতে মিথ্যা অভিযোগ করাই অপবাদ। আর তার সত্যিকার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা গীবত। এ কাজ স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে করা হোক বা ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে করা হোক সর্বাবস্থায় হারাম। অনুরূপভাবে এ কাজ ব্যক্তির জীবদ্দাশায় করা হোক বা মৃত্যুর পরে করা হোক উভয় অবস্থায়ই তা সমানভাবে হারাম। আবু দাউদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

মায়েয ইবনে মালেক আসলামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপরাধে ‘রজম’ করার শাস্তি কার্যকর করার পর নবী (সা.) পথে চলতে চলতে শুনলেন এক ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলছেঃ এ লোকটার ব্যাপারটাই দেখো, আল্লাহ তার অপরাধ আড়াল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যতক্ষণ না তাকে কুকুরের মত হত্যা করা হয়েছে ততক্ষণ তার প্রবৃত্তি তার পিছু ছাড়েনি। সামনে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একটি গাধার গলিত মৃতদেহ দৃষ্টিগোচর হলো। নবী (সা.) সেখানে থেমে গেলেন এবং ঐ দু’ব্যক্তিকে ডেকে বললেনঃ “তোমরা দু’জন ওখানে গিয়ে গাধার ঐ মৃত দেহটা আহার করো।” তারা দু’জনে বললোঃ হে আল্লাহর রসূল, কেউ কি তা খেতে পারে? নবী (সা.) বললেনঃ

فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَدُّ مِنْ أَكْلٍ مِنْهُ

“তোমরা এইমাত্র তোমাদের ভাইয়ের সম্মান ও মর্যাদার ওপর যেভাবে আক্রমণ চালাচ্ছিলে তা গাধার এ মৃতদেহ খাওয়ার চেয়ে অনেক বেশী নোংরা কাজ।”যেসব ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে বা তার মৃত্যুর পর তার মন্দ দিকগুলো বর্ণনা করার এমন কোন প্রয়োজন দেখা দেয় যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে সঠিক এবং গীবত ছাড়া ঐ প্রয়োজন পূরণ হতে পারে, আর ঐ প্রয়োজনের পূরণের জন্য গীবত না করা হলে তার চেয়েও অধিক মন্দ কাজ অপরিহার্য হয়ে পড়ে এমন ক্ষেত্রসমূহ গীবত হারাম হওয়া সম্পর্কিত নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত নয়। রসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যতিক্রমকে মূলনীতি হিসেবে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الِاسْتِطَالَةَ فِى عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ(ابو داؤد)

“কোন মুসলমানের মান-মর্যাদার ওপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করা জঘন্যতম জুলুম।”এ বাণীতে “অন্যায়ভাবে” কথাটি বলে শর্তযুক্ত করাতে বুঝা যায় যে, ন্যায়ভাবে এরূপ করা জায়েজ। নবীর ﷺ নিজের কর্মপদ্ধতির মধ্যে এমন কয়েকটি নজীর দেখতে পাই যা থেকে জানা যায় ন্যায়ভাবে বলতে কি বুঝানো হয়েছে এবং কি রকম পরিস্থিতিতে প্রয়োজন গীবত করা জায়েজ হতে পারে।একবার এক বেদুঈন এসে নবীর ﷺ পিছনে নামাযে শামিল হলো এবং নামায শেষ হওয়া মাত্রই একথা বলে প্রস্থান করলো যে, হে আল্লাহ! আমার ওপর রহম করো এবং মুহাম্মাদের ওপর রহম করো। আমাদের দু’জন ছাড়া আর কাউকে এ রহমতের মধ্যে শরীক করো না। নবী (সা.) সাহাবীদের বললেনঃ

أَتَقُولُونَ هُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ؟ أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى مَا قَالَ

“তোমরা কি বলো, এ লোকটাই বেশী বেকুফ, না তার উট? তোমরা কি শুননি সে কি বলেছিলো?” (আবু দাউদ) নবীকে ﷺ তার অনুপস্থিতিতেই একথা বলতে হয়েছে। কারণ সালাম ফেরানো মাত্রই সে চলে গিয়েছিল। নবীর উপস্থিতিতেই সে একটি ভুল কথা বলে ফেলেছিলো। তাই এ ব্যাপারে তাঁর নিশ্চুপ থাকা কাউকে এ ভ্রান্তিতে ফেলতে পারতো যে, সময় বিশেষ এরূপ কথা বলা হয় তো জায়েয। তাই নবী (সা.) কর্তৃক একথার প্রতিবাদ করা জরুরী হয়ে পড়েছিলো।ফাতেমা বিনতে কায়েস নামক এক মহিলাকে দু’ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব

দেন। একজন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) অপরজন আবুল জাহম (রা.)। ফাতেমা বিনতে কায়েস নবীর ﷺ কাছে এসে পরামর্শ চাইলে তিনি বললেনঃ মুয়াবিয়া গরীব আর আবুল জাহম স্ত্রীদের বেদম প্রহার করে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম) এখানে একজন নারীর ভবিষ্যত জীবনের প্রশ্ন জড়িত ছিল। সে নবীর ﷺ কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চেয়েছিল। এমতাবস্থায় উভয় ব্যক্তির যে দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি তাঁর জানা ছিল তা তাকে জানিয়ে দেয়া তিনি জরুরী মনে করলেন।একদিন নবী (সা.) হযরত আয়েশার (রা.) ঘরে ছিলেন। এক ব্যক্তি এসে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেনঃ এ ব্যক্তি তার গোত্রের অত্যন্ত খারাপ লোক। এরপর তিনি বাইরে গেলেন এবং তার সাথে অত্যন্ত সৌজন্যর সাথে কথাবার্তা বললেন। নবী (সা.) ঘরে ফিরে আসলে হযরত আয়েশা (রা.) বললেনঃ আপনি তো তার সাথে ভালোভাবে কথাবার্তা বললেন। অথবা যাওয়ার সময় আপনি তার সম্পর্কে ঐ কথা বলেছিলেন। জবাবে নবী (সা.) বললেনঃ

-إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ (روتَرَكَهُ) النَّاسُ اِتِّقَاءِ فُحْشِهِ

“যে ব্যক্তির কটু বাক্যের ভয়ে লোকজন তার সাথে উঠাবসা পরিত্যাগ করে কিয়ামতের দিন সে হবে আল্লাহ তা’আলার কাছে জঘন্যতম ব্যক্তি।” (বুখারীও মুসলিম)এ ঘটনা সম্পর্কে যদি চিন্তা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা সত্ত্বেও নবী (সা.) তার সাথে সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলেছেন এজন্য যে, নবীর ﷺ উত্তম স্বভাব এটিই দাবী করে। কিন্তু সাথে সাথে তিনি আশঙ্কা করলেনঃ লোকটির সাথে তাঁকে দয়া ও সৌজন্য প্রকাশ করতে দেখে তার পরিবারের লোকজন তাঁকে তার বন্ধু বলে মনে করে বসতে পারে। তাহলে পরে কোন সময় সে এর সুযোগ নিয়ে কোন অবৈধ সুবিধা অর্জন করতে পারে। তাই তিনি হযরত আয়েশাকে সতর্ক করে দিলেন যে, সে তার গোত্রের জঘন্যতম মানুষ।এক সময় হযরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা এসে নবীকে ﷺ বললো, “আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমার ও আমার সন্তানের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হতে পারে এমন অর্থকড়ি সে দেয় না।” (বুখারী ও মুসলিম) স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর এ ধরনের অভিযোগ যদিও গীবতের পর্যায়ে পড়ে কিন্তু নবী (সা.) তা বৈধ করে দিয়েছেন। কারণ জুলুমের প্রতিকার করতে পারে এমন ব্যক্তির কাছে জুলুমের অভিযোগ নিয়ে যাওয়ার অধিকার মজলুমের আছে।রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের এসব দৃষ্টান্তের আলোকে ফকীহ ও হাদীস বিশারদগণ এ বিধি প্রণয়ন করেছেন যে, গীবত কেবল তখনই বৈধ যখন একটি সঙ্গত (অর্থাৎ শরীয়াতের দৃষ্টিতে সঙ্গত) কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার প্রয়োজন পড়ে এবং ঐ প্রয়োজন গীবত ছাড়া পূরণ হতে পারে না। সুতরাং এ বিধির ওপর ভিত্তি করে আলেমগণ নিম্নরূপ গীবতকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছেনঃএকঃ যে ব্যক্তি জুলুমের প্রতিকারের জন্য কিছু করতে পারে বলে আশা করা যায় এমন ব্যক্তির কাছে জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের ফরিয়াদ।দুইঃ সংশোধনের উদ্দেশ্যে এমন ব্যক্তিদের কাছে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অপকর্মের কথা বলা যারা তার প্রতিকার করতে পারবেন বলে আশা করা যায়।তিনঃ ফতোয়া চাওয়ার উদ্দেশ্যে কোন মুফতির কাছে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনার সময় যদি কোন ব্যক্তির ভ্রান্ত কাজ-কর্মের উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়।চারঃ মানুষকে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অপকর্মের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য সাবধান করে দেয়া। যেমনঃ হাদীস বর্ণনাকারী, সাক্ষী এবং গ্রন্থ প্রণেতাদের দূর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনা করা সর্বসম্মত মতে প্রচারণা শুধু জায়েযই নয়, বরং ওয়াজিব। কেননা, এছাড়া শরীয়াতকে ভুল রেওয়ায়াতের প্রচারণা ও বিস্তার থেকে, আদালতসমূহকে বে-ইনসাফী থেকে এবং জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদেরকে গোমরাহী থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। অথবা উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোন ব্যক্তি কারো সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী কিংবা কারো বাড়ীর পাশে বাড়ী খরিদ করতে চায়

অথবা কারো সাথে অংশীদারী কারবার করতে চায় অথবা কারো কাছে আমানত রাখতে চায় সে আপনার কাছে পরামর্শ চাইলে তাকে সে ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি ও ভাল-মন্দ সম্পর্কে অবহিত করা আপনার জন্য ওয়াজিব যাতে না জানার কারণে সে প্রতারিত না হয়।পাঁচঃ যেসব লোক গোনাহ ও পাপকার্যের বিস্তার ঘটাচ্ছে অথবা বিদআত ও গোমরাহীর প্রচার চালাচ্ছে অথবা আল্লাহর বান্দাদেরকে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড ও জুলুম-নির্যাতনের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সোচ্চার হওয়া এবং তাদের দুষ্কর্ম ও অপকীর্তির সমালোচনা করা।ছয়ঃ যেসব লোক কোন মন্দ নাম বা উপাধিতে এতই বিখ্যাত হয়েছে যে, ঐ নাম ও উপাধি ছাড়া অন্য কোন নাম বা উপাধি দ্বারা তাদেরকে আর চেনা যায় না তাদের মর্যাদা হানির উদ্দেশ্যে নয়, বরং পরিচায়দানের জন্য ঐ নাম ও উপাধি ব্যবহার করা। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ফাতহুল বারী, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩৬২; শরহে মুসলিম-নববী, বাবঃ তাহরীমুল গীবাত। রিয়াদুস সালেহীন, বাবঃ মা ইউবাহু মিনাল গীবাত। আহকামুল কুরআন--জাস্সাস। রুহুল মা'আনী--লা ইয়াগতাব বাদুকুম বাদান-আয়াতের তাফসীর)।এ ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রগুলো ছাড়া অসাক্ষাতে কারো নিন্দাবাদ একেবারেই হারাম। এ নিন্দাবাদ সত্য ও বাস্তব ভিত্তিক হলে তা গীবত, মিথ্যা হলে অপবাধ এবং দু'জনের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হলে চোখলখুরী। ইসলামী শরীয়াত এ তিনটি জিনিসকেই হারাম করে দিয়েছেন। ইসলামী সমাজে প্রত্যেক মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে যদি তার সামনে অন্য কোন ব্যক্তির ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হতে থাকে তাহলে সে যেন চুপ করে তা না শোনে বরং তা প্রতিবাদ করে। আর যদি কোন বৈধ শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া কারো সত্যিকার দোষ-ত্রুটিও বর্ণনা করা হতে থাকে তাহলে এ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর ভয় করতে এবং এ গোনাহ থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিতে হবে।নবী (সা.) বলেছেনঃ

مَا مِنِ امْرِئٍ مسلم يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِى مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلاَّ خَذَلَهُ اللَّهُ فِى مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ وَمَا مِنِ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِى مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلاَّ نَصَرَهُ اللَّهُ فِى مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ (ابو داؤد)

"যদি কোন ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিতে কোন মুসলমানকে সাহায্য না করে যেখানে তাকে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে এবং তার মান-ইজ্জতের ওপর হামলা করা হচ্ছে তাহলে আল্লাহ তা'আলাও তাকে সেসব ক্ষেত্রে সাহায্য করবেন না যেখানে সে তার সাহায্যের প্রত্যাশা করে। আর যদি কোন ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিতে কোন মুসলমানকে সাহায্য করে যখন তার মান-ইজ্জতের ওপর হামলা করা হচ্ছে এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করা হচ্ছে তাহলে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে এমন পরিস্থিতিতে সাহায্য করবেন যখন সে আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশী হবে।" (আবু দাউদ)গীবতকারী ব্যক্তি যখনই উপলব্ধি করবে যে, সে এ গোনাহ করছে অথবা করে ফেলেছে তখন তার প্রথম কর্তব্য হলো আল্লাহর কাছে তাওবা করা এবং এ হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা। এরপর তার ওপর দ্বিতীয় যে কর্তব্য বর্তায় তা হচ্ছে, যতদূর সম্ভব এ গোনাহের ক্ষতিপূরণ করা। সে যদি কোন মৃত ব্যক্তির গীবত করে থাকে তাহলে সে ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য অধিক মাত্রায় দোয়া করবে। যদি কোন জীবিত ব্যক্তির গীবত করে থাকে এবং তা অসত্যও হয় তাহলে যাদের সাক্ষাতে সে এ অপবাদ আরোপ করেছিল তাদের সাক্ষাতেই তা প্রত্যাহার করবে। আর যদি সত্য ও বাস্তব বিষয়ে গীবত করে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে আর কখনো তার নিন্দাবাদ করবে না। তাছাড়া যার নিন্দাবাদ করেছিল তার কাছে মাফ চেয়ে নেবে। একদল আলেমের মতে, যার গীবত করা হয়েছে সে যদি এ বিষয়ে অবহিত হয়ে থাকে, কেবল তখনই ক্ষমা চাওয়া উচিত। অন্যথায় অবহিত না থাকে এবং গীবতকারী তার কাছে গিয়ে বলে, আমি তোমার গীবত করেছিলাম তাহলে তা তার জন্য মনোকষ্টের কারণ হবে।

এ আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করে এ কাজের চরম ঘৃণিত হওয়ার ধারণা দিয়েছেন। মৃতের গোশত খাওয়া এমনিতেই ঘৃণা ব্যাপার। সে গোশতও যখন অন্য কোন জন্তুর না হয়ে মানুষের হয়, আর সে মানুষটিও নিজের আপন ভাই হয় তাহলে তো কোন কথাই নেই। তারপর এ উপমাকে প্রশ্নের আকারে পেশ করে আরো অধিক কার্যকর বানিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে নিজেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যে, সে কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে প্রস্তুত আছে? সে যদি তা খেতে রাজি না হয় এবং তার প্রবৃত্তি এতে ঘৃণাবোধ করে তাহলে সে কিভাবে এ কাজ পছন্দ করতে পারে যে, সে তার কোন মু'মিন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার মান মর্যাদার ওপর হামলা চালাবে যেখানে সে তা প্রতিরোধ করতে পারে না, এমনকি সে জানেও না যে, তাকে বেইজ্জতি করা হচ্ছে। এ আয়াতাংশ থেকে একথাও জানা গেল যে, গীবত হারাম হওয়ার মূল কারণ যার গীবত করা হয়েছে তার মনোকষ্ট নয়। বরং কোন ব্যক্তির অসাক্ষাতে তার নিন্দাবাদ করা আদতেই হারাম, চাই সে এ সম্পর্কে অবহিত হোক বা না হোক কিংবা এ কাজ দ্বারা সে কষ্ট পেয়ে থাক বা না থাক। সবারই জানা কথা, মৃত ব্যক্তির গোশত খাওয়া এজন্য হারাম নয় যে, তাতে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়। মৃত্যুর পর কে তার লাশ ছিঁড়ে খাবলে খাচ্ছে তা মৃতের জানার কথা নয়। কিন্তু সেটা আদতেই অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। অনুরূপ, যার গীবত করা হয়েছে, কোনভাবে যদি তার কাছে খবর না পৌঁছে তাহলে কোথায় কোন ব্যক্তি কখন কাদের সামনে তার মান-ইজ্জতের ওপর হামলা করেছিল এবং তার ফলস্বরূপ কার কার দৃষ্টিতে সে নীচ ও হীন সাব্যস্ত হয়েছিল, তা সে সারা জীবনেও জানতে পারবে না। না জানার কারণে এ গীবত দ্বারা সে আদৌ কোন কষ্ট পাবে না। কিন্তু এতে অবশ্যই তার মর্যাদাহানি হবে। তাই ধরণ ও প্রকৃতির দিক থেকে কাজটি মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া থেকে ভিন্ন কিছু নয়।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে অহেতুক কারো ব্যাপারে বেশি বেশি কু-ধারণা করা থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। কারণ অধিকাংশ ধারণাই পাপ, এতে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, সুসম্পর্ক বিনষ্ট হয়, যার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা হয় তাকে নিয়ে গীবত ও নিন্দা করা হয়। এসব কিছুই পরস্পরের মধ্যে শত্র"তার সৃষ্টি করে যার ফলে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়।

একজন মু'মিন অন্য মু'মিনের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করা পাপ কাজ। বরং মু'মিনদের পরস্পরের প্রতি ধারণা হবে ভাল। তাই মু'মিনদের ব্যাপারে অনাকাক্সিক্ষত কোন সংবাদ শুনলেই খারাপ ধারণা করা যাবে না, সে বিষয়ে সঠিক তথ্য জানতে হবে। যেমন আয়িশাহ (রাঃ)-এর ব্যাপারে মুনাফিকরা যখন খারাপ কথা প্রচার শুরু করল তখন কতক মু'মিনও তা বিশ্বাস করে খারাপ ধারণা করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের তিরস্কার করে বললেন : যখন মু'মিন এমন সংবাদ শুনল তখন নিজেদের ব্যাপারে কেন ভাল ধারণা

করেনি? তবে কেউ অন্যায় ও শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত হলে তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা করা যেতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা ধারণা করা বড় মিথ্যা। অন্যের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করো না এবং অন্যের দোষ-ত্র“টির খোঁজে লিপ্ত হয়ো না। তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ করো না এবং পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করো না বরং হে আল্লাহ তা‘আলার বান্দাগণ পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন কর। (সহীহ বুখারী হা. ৬৭২৪, সহীহ মুসলিম হা. ২৫৬৩)

(وَلَا تَجَسَّسُوا)

অর্থাৎ তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না, গোয়েন্দাগিরী করো না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোয়েন্দাগিরী খারাপ কাজে হয়ে থাকে। এটাকে আরবিতে التحسس বলা হয়। আর التحسس (অর্থাৎ তালাশ করা) অধিকাংশ সময় কল্যাণকর কাজে হয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

(يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَأَخِيْهِ)

‘হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার সহোদর ভাইয়ের অনুসন্ধান কর।’ (সূরা ইউসুফ ১২ : ৮৭) সুতরাং কারো ক্ষতি বা হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য দোষ বা ব্যক্তিগত বিষয় খুঁজে বেড়ানো নিষেধ।

আল্লামা আলূসী তাফসীর রুহুল মা‘আনীতে বলেন : التجسس শব্দের অর্থ অন্যের গোপন বিষয় সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা। যে সকল দোষ উল্লেখ করাকে মানুষ খারাপ মনে করে কিংবা অন্য কেউ তা জানুক সে তা পছন্দ করে না এমন সব বিষয় জানার চেষ্টা করা।

আবূ বারযাহ আসলামী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা আমাদেরকে বক্তৃতার সময় বললেন : তোমাদের যাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি অথচ মুখে ঈমান এনেছ, তোমরা মুসলিমদের দোষ-ত্র“টি খুঁজে বের করো না। যে ব্যক্তি মুসলিমদের দোষ-ত্র“টির পেছনে লেগে থাকে আল্লাহ তা‘আলা তাকে ঘরের মধ্যেই অপমানিত করবেন। (আবূ দাউদ হা. ৪৮৮২, সহীহ)

অপরের বাড়িতে উঁকি মেরে দেখাও দোষ খোঁজার অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে বলা হয়েছে, কেউ বিনা অনুমতিতে কারোর ঘরে উঁকি মেরে দেখলে তার চোখ ফুটা করে দাও। (সহীহ বুখারী হা. ৫৯২৪)

অন্য বর্ণনায় এসেছে : যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা শোনার জন্য কান খাড়া করে অথচ তারা তা অপছন্দ করে, কিয়ামতের দিন তার দুই কানে গলিত শিশা ঢালা হবে। (সহীহ বুখারী হা. ৭০৪২)

তবে মুসলিম সরকার ইসলামী রাষ্ট্রের শত্র“দের তথ্য সংগ্রহ ও রাষ্ট্রোদ্রোহীদের অবস্থান জানার জন্য গোয়েন্দা নিযুক্ত রাখতে পারেন।

(وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا)

‘তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কারো গীবত না করে’ অর্থাৎ অন্য লোকের কাছে কোন ব্যক্তির দোষ-ত্র“টি তার অনুপস্থিতিতে বলো না যা শুনলে সে ব্যক্তি কষ্ট পায়।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন : বলা হলো : হে আল্লাহর রাসূল! গীবত কী? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : তোমার ভাইদের এমন কিছু উল্লেখ করো যা সে অপছন্দ করে। বলা হলো : আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইদের মাঝে থাকে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : তুমি যা বলছ তা যদি তার মাঝে থাকে তাহলে তুমি তার গীবত করলে আর যদি না থাকে তাহলে তুমি তাকে অপবাদ দিলে। (সহীহ মুসলিম হা. ২৫৮৯)

গীবত এমন একটি জঘন্য ও নিন্দনীয় অপরাধ, আল্লাহ তা‘আলা তা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। গীবত অঙ্গ-ভঙ্গি, কথা ও কাজ যে কোনভাবে হতে পাবে। গীবত করা ও শ্রবণ করা সমান অপরাধ।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত বেশি বেশি ধারণা করা, গোয়েন্দাগিরি করা ও গীবত করা একেতো হারাম আবার এগুলো এমন ধ্বংসাত্মক আচরণ যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব, কলহ, বিবাদ ও ফাসাদ সৃষ্টি করে। বিশেষ করে মহিলাদের মাঝে গীবত করার প্রচলন বেশি। তারা দুজন একত্রিত হলে তৃতীয় আরেক জনের গীবত না করে ওঠেই না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ

যে ব্যক্তি আমার কাছে তার দুচোয়ালের মধ্যবর্তী স্থান ও দু'রানের মধ্যবর্তী স্থান সংরক্ষণের দায়িত্ব নেবে আমি তার জান্নাতের যাওয়ার দায়িত্ব নেব। (সহীহ বুখারী হা. ৬৪৭৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুখ দিয়ে কোন প্রকার পাপ করবে না এবং লজ্জাস্থানের অপব্যবহার করবে না রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জান্নাতে প্রবেশের দায়িত্ব নেবেন। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুসলিম ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সম্মানহানি করা হারাম করেছেন এবং কারো প্রতি খারাপ ধারণা করবে তাও হারাম করেছেন। (সিলসিলা সহীহাহ হা. ৩৪২০)

অতএব আমাদের সকলের উচিত এসব ঘৃণ্য আচরণ পরিহার করে সুন্দর, সুখী ও সমৃদ্ধশালী পরিবার ও সমাজ গঠন করা।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয় :

১. অহেতুক কারো ব্যাপারে কু-ধারণা করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

২. ফাসাদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে গোয়েন্দাগিরি করা হারাম।

৩. গীবত একটি ঘৃণ্য আচরণ যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে ধ্বংস করে।